বাংলার সঙ-এ অশ্লীলতার রঙ্গরস

অতনু মিত্র

সারসংক্ষেপ

প্রাচীনকালে নাটকীয় অভিব্যক্তির দ্বারা ভাব প্রকাশ করার সার্বজনীন মাধ্যম ছিল 'সঙ' বা 'সং' (SWANG)। সেই আদিকাল থেকেই বাংলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের পোশাক পরে সঙ শিল্পীরা নানা অঙ্গভঙ্গি ও মুখভঙ্গি সহযোগে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ঘটনা গান, ছড়া কাটা প্রভৃতির দ্বারা কৌতুক ও পরিহাসের মাধ্যমে তুলে ধরতেন। তাতে শহর ও গ্রামের 'বাবু-বিবিদের' কেচ্ছা, অন্যায় ও দাদাগিরির ঘটনা যেমন সকলে জানতে পারতেন, তেমনি ভাবে সমাজের অনাচার, দুর্নীতিকে প্রধান্য দিয়ে তুলে ধরা হতো। শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্-স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বীজ বপনে সঙের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ব্রিটিশরাও বাধ্য করতো সঙ বন্ধ করতে। সকল সভ্যতার আদিপর্বে এই সঙ প্রচলনের কথা বহু লেখক উল্লেখ করেছেন। মানুষের বিনোদনের বড় ক্ষেত্র হলেও সেদিনের সঙে অশ্লীলতার রঙ্গরস সমাজের অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। আধুনিক সমাজের উন্নততর প্রযুক্তির বিনোদনের বিশ্বে আজ তা অবলুপ্ত। বৈচিত্র্য ও জীবনবোধে পরিপূর্ণ বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির এই প্রবাহমান ধারা সঙ-এর অবলুপ্তির ইতিহাস আলোচ্য নিবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

সূচক শব্দ: *সঙ, লোকসংস্কৃতি, জাতীয়তাবাদী, গাজন, চড়ক, অশ্লীল, রঙ্গরস।*

১

'ছো' বা 'ছৌ' নাচের ভিত্তিভূমি হলো গাজনের 'ছো' বা 'সঙ'। সুধীর করণের মতে 'ছো' কথাটির অর্থ হলো 'সং'। 'ছো' শব্দটি ওড়িয়া 'ছু-অ' (ছলনা) শব্দের সঙ্কুচিত রূপ। এর মাধ্যমে 'সঙ' সাজা বা 'ঢং' দেখানো বোঝায়। গাজনের সঙ বলতে ছো-নাচকে বোঝায় যা শিব-দুর্গার বিবাহকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত এক উৎসব। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য ছো-নাচকে 'ছৌ-নাচ' নামে অভিহিত করেছেন।[১] মানভুম গবেষক দিলীপ কুমার গোস্বামীও মুখে কালি বা মুখোশ পরে নাচকেই 'ছৌ নাচে'র আদিরূপ বলে মনে করেছেন[২]

> 'ভারতবর্ষে শিবপূজার প্রাচীনত্ব সমধিক। ইহা বা ইহার আদিম প্রতিরূপ প্রাক্-বৈদিক যুগ হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল এ অনুমান অসঙ্গত নহে। সিন্ধুনদের উপত্যকায় যে সব প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে উহা এই বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে। বেদের 'রুদ্র দেবতার রূপকল্পনার মধ্যে এই আদিম দেবতার রূপের কিঞ্চিৎ প্রকাশ ঘটে এবং এই বৈদিক ও অবৈদিক দেবতার সংমিশ্রণে যে 'শিব'-দেবতার রূপ বিকশিত। হয়, পরে উহাই সাম্প্রদায়িক শৈবধর্মের প্রতীক-দেবতারূপে পরিকল্পিত হয়। সাম্প্রদায়িক শৈব ধর্মও যে বৈদিক যুগের শেষের দিকে বিকাশ লাভ করিয়াছিল তাহার সাহিত্যগত নিদর্শন পাওয়া যায়।[৩]

বাংলায় শৈবদের সংখ্যা খুব কম ছিল না। এই শিব ভক্তগণ চৈত্র-বৈশাখ মাসে আড়ম্বরের সঙ্গে শিবের আরাধনা করেন। দুই ধরনের ভক্ত বা সন্ন্যাসী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। যারা চৈত্র মাসে শিবের সাধনা করেন তাঁদের বলা হয় শিব সন্ন্যাসী। আর যারা বৈশাখ মাসে শিবের সাধনা করেন তাঁদের বলা হয় ধর্ম সন্ন্যাসী। গাজনের সময় এই সন্ন্যাসীরা নানারকম সঙ সেজে ঘুরতেন।[৪]

শিক্ষক, তারাকালী বিদ্যাপীঠ, মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

বাংলায় ভ্রাম্যমাণ পরিবেশনা হিসেবে সঙ-এর জন্ম বা প্রচলন হয়েছিল। বাংলাদেশে সঙের চল বহুদিন থেকেই। সাধারণত বিভিন্ন পূজা-পার্বণে সঙ বের করার একটা প্রথা ছিল। সকলকে আনন্দ দেবার জন্যই প্রাচীনকালে মানুষ পূজা-পার্বণে সঙ বের করতেন। মূখ্যত চিত্তবিনোদনের জন্যই সঙের সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলাদেশের ঢাকায় প্রায় তিনশো বছর পূর্বে জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠানের শোভাযাত্রায় সঙ বের হতো। তখনও কলকাতায় জেলেপাড়ার সঙ বের হয়নি।[৫] লোকসংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে তখন অবিভক্ত বাংলায় সঙের প্রচলন। ১৮৮৬ সালের ২৪ মে কলকাতা শহরে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহাসমারহে সঙের দল ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপ ছড়া কাটতে কাটতে পৌর কমিশনারের বাড়ির সামনে সমবেত হয়েছিল

> আয়রে ভাই সবাই মিলে, বাহু তুলে, হরি বলে নাচি চল!
>
> সহরে কসাই-কালী-জবাই-বলি-ঢলাঢলি যত ছিল।[৬]

চৈত্র সংক্রান্তির দিন গাজনের দল ঢাক কাঁসি নিয়ে বাংলার পল্লী গ্রাম ও শহরের বাজারে ঘুরে বেড়াত। তাদের সঙ্গে সঙ বের হত। চৈত্র সংক্রান্তির পরের দিন পয়লা বৈশাখ অজ্ঞাত ভবিষ্যতকে সানন্দে বরণ করতে সঙের খেলায় মেত উঠতেন আপামর বাঙালি। গাজনের ভক্তদের মধ্যে থেকে দু'জনকে শিব ও দুর্গা সাজানো হত। অন্য ভক্তরা নন্দী, ভৃঙ্গী, ভূতপ্রেত, দৈত্যদানব প্রভৃতির সঙ সেজে নৃত্য করতে করতে রাস্তায় পরিভ্রমণ করে শিবের নানা লৌকিক ছড়া ও গান পরিবেশন করতেন। মুখে নানা রঙ মেখে, বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরে এই সঙের শোভাযাত্রা বের হতো দ্বিপ্রহরে। শেষ হতো মধ্যরাতে বা ভোরে। নানা ঘটনাবলীর নাটকীয় ভাব প্রকাশের প্রাচীনতম মাধ্যম ছিল সঙ। গ্রীস, মিশর, রোম, বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহু বছর ধরে সঙের প্রচলন ছিল। বাংলাদেশের সঙ খুবই প্রাচীন। এই সঙ পরিবেশনা শিল্প প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'গৌড়-বঙ্গের প্রাচীন সংস্কৃতির এক অভিনব বিকাশ হইতেছে গত কয়েক শত বৎসর ধরিয়া প্রচলিত চিত্তবিনোদনের ধারা 'সঙ্'[৭]। মেদিনীপুর শহরে বিশেষত চৈত্র-বৈশাখ মাসে গাজনের সময়েই মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য বেশি সঙ বের হত। মেদিনীপুর শহরে সঙ প্রচলিত হয় বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়।[৮] তখন জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানা প্রকারের ঘটনা এই সঙ-এর মাধ্যমে প্রকাশ পেত। তাই সেই সময় কালে এই সঙ ছিল জনপ্রিয় পূজা অনুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ। সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সঙ এর রীতিগুলি নাট্যকলায় অঙ্গীভূত হয়েছে।

মাঠের ধান বাড়িতে আসার পর সাধারণত এই সময় খাদ্যের সমস্যা থাকে না। সকলে আনন্দে থাকেন। এই সময় আবহাওয়া খুব মনোরম। গরম থাকে না। বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তাই বহুরূপীদের মুখের বা গায়ের রঙ ধুয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না।

পৃথিবীর বহু দেশে সঙের প্রচল ছিল। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে' বলেছেন

> ভারতীয় ও মিশরীয় সভ্যতায় এই ভঙ্গি ইতিপূর্বেই অভিনয়-কলা রূপে বিকাশ ও স্বীকৃতি লাভ করেছিল। প্রাচীন গ্রীকগণ কখনও-কখনও সঙের সঙ্গে সমবেত সংগীত যুক্ত করে দিতেন। প্রাচীন গ্রীসে কেবল দেবতা ও বীরপুরুষ-সম্পর্কিত পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে সঙের অভিনয় হত। পরবর্তী কালে গ্রীসে ও রোমে সঙের দ্বারা সমকালীন প্রসঙ্গ অর্থাৎ তখনকার রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিদ্রুপ করেও অভিনয় করা হত। রোমকগণ এই বিষয়ে সবিশেষ তৎপর ছিলেন। রোম-সাম্রাজ্যে এই বিশিষ্ট অভিনয়-কলা বহুল পরিমাণে বিকাশ লাভ করেছিল। এমন কি এই কলার অনুশীলন ও পরিবর্ধনের জন্য শিক্ষালয় স্থাপিত হয়েছিল। বিভিন্ন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার জন্য তারা নানারকম মুখোশ ব্যবহার করতেন[৯]।

প্রধানত চৈত্র সংক্রান্তিতে সঙ বের হয়ে থাকলেও অন্যান্য পূজা-পার্বণে, বিবাহ অনুষ্ঠানে চিত্তবিনোদনের জন্য সঙের ব্যবস্থা ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সংবাদপত্রে সেকালের কথায়' কলকাতা দ্বারিকানাথ ঠাকুরের নতুন বাড়িতে সঙ-এর প্রমোদমূলক অনুষ্ঠানের কথা তুলে ধরেছেন

> ''নতুন গৃহ সঞ্চয়। মোং কলকাতা-১১ ডিসেম্বর, ২৭ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর স্বীয় নবীন বাটীতে অনেক ভাগ্যবান সাহেব ও বিবিরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া চতুর্বিধ ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন এবং ভোজনাবসানে ওই ভবনে উত্তম গানে ও ইংলণ্ডীয় বাদ্য শ্রবণে ও নৃত্য দর্শনে সাহেবগণে অত্যন্ত আমোদ করিয়াছিলেন। পরে ভাড়েরা নানা শং করিয়াছিল কিন্তু তাহার মধ্যে গো বেশ ধারণপুর্ব্বক ঘাস চর্বণাদি করিল''।[১০]

বাংলায় সঙের বহু দল ছিল। এক একটা পাড়া অনুযায়ী একটা দলের নাম হত। কলকাতার জেলেপাড়ার সঙ, কাছারিপাড়া সঙ, আহিরিতলা সঙ, খিদিরপুরের সঙ, শিবপুরের সঙ, বেনেপুকুর সঙ, শ্রীরামপুরের সঙ, মেদিনীপুরের সঙ, বীরভূমের সঙ প্রভৃতি সঙের গানের ভাষা বিভিন্ন হলেও সেগুলি সাধারণ মানুষজনের কাছে খুবই সহজ বোধ্য ছিল। সেগুলি রঙ্গরসে ভরপুর ছিল। ব্যঙ্গের বিষয়বস্তুকে আরো তীব্র ও কটাক্ষ করার জন্য লেখকগণ বাংলার সঙ্গে ইংরেজি শব্দ মিশিয়ে দিতেন

> লেট মি গো ওরে দ্বারী। আই ভিজিট টু বংশীধারী।
>
> এসেছি ব্রজ হতে, আমি ব্রজের ব্রজনারী।[১১]

দুই শতাধিক বছর পরেও কলকাতার কালীঘাটের সেই চড়কের ছবি খুব একটা বদলায়নি। পটুয়াপাড়া থেকে সন্ন্যাসীরা ঠিক সেই আগের মতোই সাজসজ্জা করে ঢাকের তালে নাচতে নাচতে নকুলেশ্বর মন্দিরের সামনে পৌঁছে ধুনো পোড়ান। শিব জ্ঞানে সন্ন্যাসীদের পায়ে লুটিয়ে পড়েন ভক্তিমান স্থানীয় মানুষজন। তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করেন কেউ কেউ। সেই সঙ্গে নানা পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রের সাজে সেজে সঙের মিছিলও বের হয়।[১২]

বাংলার নানা স্থানে একাধিক সঙের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিল জেলেপাড়ার সঙ। নতুন পরিকল্পনা নিয়ে জেলেপাড়ার সঙ যাত্রা শুরু করে ১৩২০ সালের চৈত্র মাসে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দিয়ে আগে থেকেই গান নিয়ে প্রস্তুতিপর্ব চলত। নির্মলচন্দ্র স্ট্রিট, চিৎপুর রোড, কলেজ স্ট্রিট, আমহার্স্ট স্ট্রিট, বউবাজার প্রভৃতি এলাকার অসংখ্য মানুষ জেলেপাড়ার সঙ উপভোগ করার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতেন। বাবুদের কেচ্ছা, দরিদ্র ও শোষিতদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবাদ স্বরূপ জেলেপাড়া সঙ পরিবেশিত হত। কিন্তু তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এই গান ও ছড়াকে রাজনৈতিক আন্দোলন সন্দেহ করে এবং সরকারের বিরুদ্ধে সঙ এর গানগুলি পরিবেশিত হওয়ার জন্য ১৯৩১ সালে জেলে পাড়া সঙ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বন্ধ করার চেষ্টা করে।[১৩] ১৩৩৬ সালে শেষবারের মতো জেলেপাড়ার সঙ বের হয়েছিল। তারপর বরাবরের মতো এই সঙ বন্ধ হয়ে যায়।

কাছারিপাড়া সঙ বের হত উত্তর কলকাতার বারানসি ঘোষ স্ট্রিট থেকে। সঙের মিছিলে পরিহাসমূলক এবং রসাত্মক গানের সঙ্গে নানা অঙ্গভঙ্গি থাকতো। তাতে কখনও কখনও অশ্লীলতাও প্রকাশ পেত। তাই 'অশ্লীলতা নির্বাচনী সভা' প্রতিষ্ঠা করে এই সঙ বন্ধ করে দেওয়া হয়।[১৪]

২

কলকাতার জেলেপাড়া ও অন্যান্য এলাকার সঙ:

চড়ক সংক্রান্তির সঙ প্রসঙ্গে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'প্রগাঢ় রসবিৎ হিন্দুগণ আজ চৈত্র সংক্রান্তির দিন সংসারে সঙ বাহির করিয়া থাকেন। এ যে কেবল সং-এর খেলা, এ যে কেবল ব্যঙ্গ, কেবল বিদ্রুপ, নিয়তির সহিত কেবল উপহাস। সেই টুকু বুঝাইবার জন্য আজ সংক্রান্তির সং যোটান হয়।' সঙ কাউকে মজা বা আঘাত দেওয়ার জন্য নয়। পল্লীবাসীরা কেন সঙ সাজতেন তা স্পষ্ট করে শোনা যায় কাসুন্দিয়া সঙ থেকে

মোদের এ সঙ নয় শুধু কালি মেখে সঙ সাজা,
নয়কো শুধু হালকা হাসি, নয়কো শুধু মজা।
সংসারেতে সাজার ওপর সাজেন যিনি যে যা,
তারি ছবি দেখাই সবে সহজ ভাষায় সোজা।
সমাজনীতি, ধর্মনীতি, শিক্ষানীতি আদি,
বলতে গিয়ে কারো প্রাণে ব্যথা দি যদি।[১৫]

অমৃতলাল বসুর লেখা সরস গান জেলেপাড়া সঙকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল তা 'পুরশ্রী'তে বর্ণনা করেছেন স্বপন বক্সী। ১৯১৭ সালের এপ্রিলে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পরপর দু'বার চুরি হয়। তাই পরীক্ষা বাতিল হয়ে যায়। সেই বিষয় নিয়ে তিনি 'প্রবাসী'তে গান রচনা করেন। জেলেপাড়ার সঙের সেই গান খুব জনপ্রিয় হয়:

বিদ্যার মন্দিরে এ সিদ কেটেছে কোন চোরে;
সখী নেকী নাকি পড়লো ফাঁকি
কেউ দেখেনি ঘুমের ঘোরে।।
বিদ্যা সর্ব্ববিদ্যা অধিকারী (১)
দেবের প্রসাদে গুমোর গো ভারি,
নইলে নারী হয়ে জয়ের জারি,
বিদ্যা নিত্য পূজে আশুতোষে, (২)
থাকে উপোসে,
চন্দ্রমোহন (৩) বদনখানি
ঘোমটা দিয়ে ঢাকেন রাণী,
নিলেন বাইশ বুরুল (৪)
গুণসিন্ধুযুত নব যুব রায় (৫) এই শহরে
এখন ধূমকেতু তার ভাগ্যাকাশে

মশান ভাসে নয়ন ঝোরে।।

এখানে তিনি সকল আধিকারীকের বর্ণনাও দিয়েছেন। (১) সর্ববিদ্যা অধিকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। অপরপক্ষে বর্ধমানাধিপতি বীর সিংহের কন্যা।

(২) স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। অপরপক্ষে মহাদেব।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার চন্দ্রভূষণ মৈত্র। অপরপক্ষে সুন্দর মুখ।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন রেজিস্ট্রার ড. পি জে বুরুল।

(৫) কাঞ্চি নগরাধিপতি গুণমুগ্ধ-পুত্র বিদ্যালাভার্থী যুব রায়। অপরপক্ষে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীগণ।[১৬]

অমৃতলাল বসু তাঁর সরস গান ও কৌতুকপূর্ণ রচনার মধ্য দিয়ে জেলেপাড়ার সঙের গৌরব ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছিলেন। কিন্তু পরে তাতে অশ্লীলতা, কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি যুক্ত হওয়ায় ধীরে ধীরে এই সঙের অবলুপ্তি ঘটেছে। অথচ জেলেপাড়ার সঙ ছিল তৎকালীন সমাজের দর্পণ। জেলেপাড়ার সঙে সমাজের অনাচার, দুর্নীতিকে যেমন প্রাধান্য দিয়ে তুলে ধরা হতো, তেমনি শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সচেতনতার ক্ষেত্রেও জেলেপাড়া সঙ-এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এ প্রসঙ্গে। ১৩৩২ সালের ১ বৈশাখ আনন্দবাজার পত্রিকা মন্তব্য করেছে

> 'কলিকাতার বিখ্যাত জেলেপাড়ার সং এই চৈত্র সংক্রান্তি বা চড়ক পূজার স্মৃতিচিহ্ন। পূর্ব্বে কাসারীপাড়ার সং, জেলেপাড়ার সং প্রভৃতি বিখ্যাত ছিল। এখনও যাহা আছে, তাহাকে অশ্লীল বা কুরুচি বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। এই 'সং'গুলি এক সময়ে আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের একটা শ্রেষ্ঠ উপায় ছিল। 'সং'গুলিকে উপেক্ষা না করিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিরা যদি এগুলিকে নব যুগের আধুনিক কালের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারেন, তবেই কাজের মত কাজ হয়।[১৭]

শুধুমাত্র চৈত্র-সংক্রান্তির গাজনে সঙ সাজা হয় না। বুদ্ধ পূর্ণিমার গাজন, ধর্মের গাজন, অক্ষয় তৃতীয়ার গাজনেও সঙ বের হত। হাওড়া জেলার লোকসংস্কৃতি হলো 'চৈতি বাউল'। চৈত্র মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে হাওড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে 'চৈতি বাউল' এর প্রচলন আছে। এই সময় এখানে গাজনে সঙ সাজা হয়।[১৮] ব্রিটিশ আমলে 'আলকাপ'-এ শিবের সঙ সেজে অনেক অভিনয় করতেন। ছেলেরা মেয়ে সেজে অভিনয়ের মাধ্যমে লোক হাসাতেন। মালদহ ও মুর্শিদাবাদে 'আলকাপ' বেশি দেখা যায়। সঙের মত সমাজ জীবনের নানা বিষয়কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও প্রতিবাদের মাধ্যমে এই লোকনাট্যে তুলে ধরা হতো।[১৯] মালদহ জেলার একটি গুরুত্ব লোকনাট্য হলো 'গম্ভীরা'। এখানে শিবের গাজন বা পূজোকে কেন্দ্র করে 'গম্ভীরা'র প্রচলন। সমাজ, পরিবার, ব্যক্তি, ধর্মীয় রীতি প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে গান ও নাটকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরিবেশিত হয় গম্ভীরা। মূলত সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়বস্তুকে হাস্যরসাত্মক করে আঞ্চলিক ভাষায় তা পরিবেশিত হয়। 'গম্ভীরা'ও এক কথায় শিবের গাজন।[২০]

মেদিনীপুরের সঙের খুব গৌরব ছিল। জেলার জমিদার ও বর্ধিষ্ণু পরিবারগুলির বেশিরভাগই শৈব হওয়ায় এই জেলায় শিবমন্দিরে সংখ্যাধিক্য ঘটেছে। জেলার বহু গ্রামে শতাব্দী প্রাচীন শিব মন্দির রয়েছে। এই সকল মন্দিরে শিবের গাজন হয় চৈত্র মাসে। এই গাজনে সঙের প্রচলন ছিল। মেদিনীপুর শহরের মিরবাজার, কর্ণেলগোলা, মানিকপুর, বিবিগঞ্জ, পাটনাবাজার, মির্জাবাজার, বল্লভপুর সহ প্রভৃতি এলাকায় গাজনসহ অন্যান্য পূজা অনুষ্ঠান উপলক্ষেও সঙ বের হতো। জেলা শহরের বাইরে ঘাটাল, খড়্গপুর, চন্দ্রকোণা, বেলদা, গড়বেতাতেও এক সময় সঙ নিয়ে খুব হৈ চৈ পড়তো। শহরে সঙ চর্চার প্রাচীন কেন্দ্র ছিল

মিরবাজারে। এখানে বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে গাজনের অনুষ্ঠান হত। পরদিন পয়লা জ্যৈষ্ঠ এখান থেকে সঙ বের হতো। এই সঙে থাকতো কালীমূর্তি, রাক্ষসের মূর্তি, কঙ্কাল, কামান, হাতি প্রভৃতি। ধামসা, মাদল ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গান গেয়ে নাচতে নাচতে সঙ শিল্পীরা শহরের বিভিন্ন রাস্তায় পরিভ্রমণ করতেন। মিরবাজার থেকে ১৯৫৬ সালে শেষ সঙযাত্রা বের হয়েছিল।[২১]

পাটনাবাজারের সঙ বের হতো জন্মাষ্টমীর পর নবমীর দ্বিপ্রহরে। তাতে থাকতো চাকা লাগানো ফটক, রাধাকৃষ্ণ মূর্তি, কাগজের তৈরি হাতি, গদাভারত, পটুয়ার গান, হাতে টানা কয়েকটি গরুর গাড়ি, লাঠি খেলা, কাঠি নাচ প্রভৃতি। এইরকম ১২৫ ধরনের বিষয় নিয়ে ১৯৩০ সালে একটি বর্ণাঢ্য সঙযাত্রা বের হয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সোনার পাতা লাগানো রূপোর গাছে মুক্তার ফল আর শোভাযাত্রার রঙ্গরসিকতা। এই ধরনের এক একটি সঙ প্রস্তুত করতে প্রায় ৬ মাস সময় লাগত। ১০০ বছর আগে এই ধরনের এক একটি সঙযাত্রায় অন্তত ৫ হাজার টাকা খরচ। মির্জাবাজারের সঙযাত্রা আয়তনে সামান্য ছোট হতো। ১৯৩২ সালে তাদের সর্বশেষ সঙযাত্রায় ব্যয় হয়েছিল প্রায় আড়াই হাজার টাকা।[২২]

সঙের শোভাযাত্রায় থাকতো হাতে টানা কয়েকটি গরুর গাড়ি। বিভিন্ন রাস্তার সংযোগস্থলে সেই গাড়িগুলোকে মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করে সং শিল্পীরা কৌতুক নাট্য পরিবেশ করতেন। এরকম কয়েকটি কৌতুক নাট্য হল 'যমরাজের মেদিনীপুর দর্শন', 'ধামামঙ্গল', 'যমরাজ ও চিত্রগুপ্ত' প্রভৃতি। আসলে এই নাটকগুলির মূল বিষয় ছিল শহরের 'বাবু-বিবিদের' কেচ্ছা, অন্যায়, দাদাগিরিকে কৌতুকের মাধ্যমে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা। জেলা বোর্ড, পৌরসভা, হাসপাতালসহ স্থানীয় প্রশাসনের নানা 'কীর্তি' এই নাটকে স্থান পেতো। সাহিত্যিক আজাহারউদ্দিন খান, পুলক আঢ্যদের মত কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সঙ গান রচনা করতেন। দীপঙ্কর দাস এই রকম কিছু সঙ গান 'নীলোৎপলে' লিপিবদ্ধ করেছেন।[২৩] খাদ্য দপ্তরের দুর্নীতিকে ব্যঙ্গ করতে সঙ গান ছিল:

'সাপ্লাই অফিস দেখুন মশাই,
এখানে যত সব যুধিষ্ঠিরের নাতি।
ভক্তিভরে শিন্নি দিলে,
এরা ছুঁচে গলায় হাতি।'

শহরের নতুন একটি সিনেমা হল চালু হতেই সঙ গান লেখা হল:

'ছায়াছবির ঘর দেখুন,
মাথায় টিনের সিট।
গুপ্ত প্রেমের শ্রীবৃন্দাবন,
বড়ই সিদ্ধ পীঠ'।

সেই সময় মদের বোতলের লেবেলে প্রস্তুতকারকের নামের পাশে লেখা থাকতো তার যোগ্যতা বিএ বা বি এসসি। তা দিয়ে সেবার সঙ গান হল:

'বোতলেতে গ্রাজুয়েট,
লিখিয়া ভরাওপেট'।

সঙে নারী বিষয় নিয়ে বেশি ছড়া লেখা হতো। সেগুলি শ্লীল এবং অশ্লীল দুইই হতো। সেগুলি বেশি আকর্ষণীয় হতো। আধুনিক মহিলাদের নিয়ে খুবই মুখরোচক সঙ গান ছিল

'নাচ শিখেছি গান শিখেছি,
আমরা আধুনিকা নারী।
ধরবো নাকো হাঁড়ি কানা,
মা মোদের করেছে মানা,
বাবুর্চি যোগায় খানা,
যখন যা চাই রকমারি।
আমরা আধুনিক নারী।'

কোনো বিধবা মহিলা আড়ালে আমিষ খেলেই লেখা হতো:

'হাঁড়ির ভিতর কাঁকড়া রেখে,
মালা কটকটায়।'

তখন থেকেই গ্রামাঞ্চলে কেউ অকারণে সেজে এলে তাচ্ছিল্যের সুরে বলা হত 'এতো সঙ সাজার কি আছে?' বলা যায়, তখন এই সঙ গানে বিদ্রুপের চেয়ে ব্যঙ্গ বেশি ছিল। কয়েক মাস ধরে যাত্রার প্রস্তুতির সময় খবর রাখতেন শহরের বাবুরা। কেউ তাদের কোনো কেচ্ছা নিয়ে নাটক বা সঙ গান লিখছেন কিনা। মাঝেমাঝে গুজব ছড়ালে এই বাবুরা আতঙ্কিত হয়ে পড়তেন। চারদিকে খোঁজ খবর নিতে শুরু করতেন। টাকা দিয়ে একটা রফায় আসার চেষ্টা করতেন।

৩

সঙের সামাজিক ভূমিকা

১৯২৯ সালে ভারতে মেয়েদের বিবাহের বয়স ন্যূনতম ধার্য করতে 'শারদা আইন'* চালু হয়েছিল। তার প্রতিবাদ করে জেলেপাড়ার সঙ:

বিয়ে নয় ঠাকুর পুজো সোজা ছেলেখেলা,
বর-কনের চোখের কোণে মন মজানো খেলা।[২৪]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৬৬ সালে ঘুরে ঘুরে কুলীনের নাম ঠিকানা, বয়স, বিবাহ সংখ্যা বিষয়ক তথ্য তাঁর 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' বইটিতে উল্লেখ করেন। হুগলী জেলার ৭৬ টি গ্রামের ১৩৩ জন কুলীনের ২১৫১ জন স্ত্রী এবং পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরের ৬৫২ জন কুলীনের ৩৫৮৮ জন স্ত্রী ছিলেন। হুগলীর বসো গ্রামের ৫৫বছরের ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মোট ৮০ টি, দেশমুখো গ্রামের ৬৪ বছরের ভগবান চট্টোপাধ্যায় মোট ৭২ টি, চিত্রশালী গ্রামের ৫৫ বছরের পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মোট ৬২ টি বিয়ে করেছিলেন[২৫]। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'নিষ্কৃতি' কবিতায় নাবালিকা মঞ্জুলিকার অসীম রোদন-ভরা অকাল বৈধব্যের মর্মন্তুদ কাহিনী তুলে ধরেছেন। তার স্নেহময়ী জননীর মৃত্যুর পর তার শিক্ষিত কুলীন পিতা পুনরায় বিবাহ করতে গেলে লজ্জাভয় ছেড়ে মঞ্জুলিকা প্রশ্ন তোলে

‘তুমি নাকি করতে যাবে বিয়ে!
আমরা তোমার ছেলেমেয়ে নাথি-নাতনি যত
সবার মাথা করবে নত?’[২৬]

এই কৌলিন্য প্রথা নিয়ে সমালোচনা করতে বিয়ে পাগল বুড়ো বরদের নিয়ে সঙের গান করতেন বরযাত্রীরা।

গন্ডা ষোল বয়স হল,
বিয়ের বয়স কি গেছে চলে।
মেয়ের বাপের মান রেখেছি,
নিন্দুকেরা কি না বলে।[২৭]

বীরভূমের এক বৃদ্ধ জমিদারের তিনজন স্ত্রী ছিলেন। তা সত্ত্বেও ৮০ বছর বয়সে তিনি ধুমধাম করে আবার বিয়ে করতে যান। এইরকম জমিদারের কীর্তি জনসমক্ষে তুলে ধরেছিল বীরভূমের সঙ শিল্পীরা

খুড়ো মশাই শুনছো ওগো
খবর জবর ভারি,
মজা কি শুন তারি!
আশীর কোঠায় ঠাকুর জামাই,
করেন শুনি কি মজাটাই![২৮]

৪

স্বদেশী আন্দোলনে সঙ

বিশ শতকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীরা সঙ-কে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতেন। তাঁরা সমাজের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের দিয়ে সঙ এর গান লেখার কাজে নিয়োজিত করতেন। সঙ এর গানগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। কলকাতার বস্তি বা ফুটপাতের লোকজন সঙ সেজে অভিনয় করতেন আর স্বদেশ-প্রেমের গান গাইতে গাইতে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতেন। সে সঙগুলি কাছারিপাড়ার সঙ, জেলেপাড়ার সঙ, খুরুটের সঙ নামে পরিচিত।[২৯] ভারতবাসীর মধ্যে স্বদেশ প্রেম জাগ্রত করতে জেলেপাড়ার সঙ শুরু করেছিল

একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি।
হাসি হাসি পরবো ফাঁসি,
মাগো, দেখবে ভারতবাসী।

ব্রিটিশদের শাসনকালে খিদিরপুরের সঙের খুব খ্যাতি ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় লোকের মুখে মুখে ঘুরত খিদিরপুরের সঙ

বউমা আমার সেয়ানা মেয়ে
চরকা কিনেছে।
ঘরের কোনে আপন মনে
সুতো কেটেছে।[৩০]

হাওড়ার খুরুট থেকে প্রায় ত্রিশ রকমের সঙ বের হতো। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বা দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের প্রয়াণে এই খুরুটের সঙ নিবেদন করেছিল

হে বঙ্গ কর্মবীর, উন্নত শির, দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত,
রাজনীতি গগন মাঝে, এখনও বিরাজে, তব স্বর প্রদীপ্ত!
তোল তোল তোল তান, মিলিত কণ্ঠে গান।
বল জয় বল জয়, জয় জয় দেশপ্রাণ।[৩১]

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় দেশবাসীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছিল খিদিরপুরের মনসাতলার সঙ:

হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার যত বিদেশী তস্কর,
সজাগ হয়েছে দেশবাসী, মজুর-চাষী লস্কর।
আমরা হয়েছি এক, কেরাণী, উকিল, মাস্টার,
আমরা তোমাদের লুটতে দেব না আর।
হিন্দু-মুসলমান গায় স্বরাজের গান,
আমরা সবাই হয়েছি একপ্রাণ।[৩২]

৫

সঙ-এ অশ্লীল রঙ্গরস

নাটকের কোন অভিনেতা বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে চরিত্রের ভাব প্রকাশ করতেন। তখন তা হত সঙ। প্রাচীনকালের যাত্রায় দুটি কারণে সঙ এর প্রচলন ছিল। প্রথমত, দর্শকদের মনোরঞ্জন। অকারণ হাস্যরস পরিবেশন করে আসর মাতিয়ে রাখতে সঙ শিল্পীরা অবান্তর উক্তি করতেন। তবে সেই অভিনয়ের মধ্যে কোন রুচি থাকতো না। দ্বিতীয়ত, সেইসময় কালে যাত্রার আসর না জমে উঠলে সঙ শিল্পীদের আসরে এনে অনেক সময় অশ্লীল রঙ্গরস, কুরুচিপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি করে নাচ করানো হতো। তা শালীনতাবিহীন হলেও তেমন নিন্দনীয় ছিল না[৩৩]

আজব শহর কলকেতা।
হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে,
বলিহারি সভ্যতা।
শহরে এক নূতন হুজুগ উঠেছে রে ভাই,
অশ্লীলতা শব্দ মোরা আগে শুনি নাই,
এর বিদ্যাসাগর জন্মদাতা,
বঙ্গদর্শন এর নেতা।[৩৪]

সঙে অশ্লীল রঙ্গরস প্রবেশ করে একশো বছর আগে ১৩২২ সাল থেকে ১৩৩৬ সালের মধ্যে। বাঁকুড়া জেলার এক 'বাগদী বামনী'র মুখ দিয়ে বলা গান থেকেই তা উল্লেখ করেছেন বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকড়ো জেলায় বাড়ী আমার,

নামটি বাদলমণি।
ভাতার ছিল, গতর ছিল,
ছিনু ঘরের ঘরনী।।
কি জানি কোন তে-মাথায়
কবে কখন মাড়িয়েছিনু তুক।।
তারি ফলে প্রসবকালে,
দেখনু গুরুপুত্তরের মুখ।।
মনে মনে বুঝনু শরীরে আর
নাইকো কোন পাপ।।
বামুন কাকা হলেন পাকা,
আমার খোকার বাপ।।
গুরু বলে পা পুজেছি,
করেছি খুড়া বলে যত্ন।
পাশে শুয়ে ভালবেসেছি,
ভেবে হৃদয়রত্ন।।
(পাড়ার) পাঁচ অভাগী ভাতার খাগী
এই ভাগ্যি ভাল দেখে।।
আমার নষ্ট নাম রটিয়ে দিলে
যত থানা পুলিশ ডেকে।।
দৈবযোগে ঘোষাল তখন
রোগের শয্যায় পড়ে।।
কলকেতাতে আনলে আমায়
কেওড়াদের কড়ে।।
কড়ে ছোড়া আসতো যেত,
বলতো আমায় মামী।।
তখন কে জানতো বল,
কালে, ভাগ্নে হবে স্বামী।।[৩৫]

প্রায় দু'শ বছর পূর্বে বাংলায় যেসব সঙ বের হতো তার অধিকাংশ ছিল অশ্লীল। গিরিশচন্দ্র ঘোষ উল্লেখ করেছেন:
থিয়েটারের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে কবি, হাফ-আকড়া, পাঁচালী ও যাত্রার প্রাদুর্ভাব ছিল। হাফ-আকড়া, কবি ও পাঁচালীতে গালি-গালাজ চলিত এবং ঐ সকল গালি-গালাজ লইয়া সমাজে সকলে বিশেষ আনন্দ করিত। যাত্রায় বড় একটা কথাবার্তা ছিল না, দু-একটা কথার পর 'তবে প্রকাশ করে বল দেখি?' বলিয়া গান আরম্ভ হইত। সেই গানের কতক আদর ছিল, কিন্তু বিশেষ আদর সঙের। সঙ হালকা সুরে গাইত, অপেক্ষাকৃত ভারি অঙ্গের পালার সুর হইতে সঙের সুরের আদর অনেকের নিকট হইত। সঙ গালাগালি

দিত। তাহা লোকের বিশেষ প্রিয় হইত। গালাগালির এত আদর ছিল যে, সংবাদপত্রের সম্পাদকে সম্পাদকে অতি অবক্তব্য ভাষায় গালি চলিত এবং ঐ সকল সংবাদপত্রেরই গ্রাহক অধিক হইত, যিনি গালাগালি দিতে সুনিপুণ হইতেন, আদর তাঁহার বেশী ছিল'[৩৬]

সঙ এর অবলুপ্তি প্রসঙ্গে অমৃতলাল বসু বলেছেন, 'ছোট, মন্দ, অশ্লীল প্রভৃতি বলিয়া আমরা আমাদের কত জিনিসই না হারাইয়াছি ও হারাইতে বসিয়াছি। ছোটকে বড়, মন্দকে ভাল, অশ্লীলকে শ্লীল করিয়া লইতে যদি আমরা চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের অনেক জিনিস নিজস্ব থাকিয়া যায় এবং জগতের দৃষ্টিতে এত ক্ষুদ্র- এত হেয় হই না। সঙ ছোট নয়, হীন নয়, অশ্লীল নয়। সকল দেশে সকল সময়ই কোন-না-কোন রূপে সং লোক-সমাজে আত্মপ্রকাশ করে। তবে বাঙ্গালাদেশে কতকগুলি অশিক্ষিত, অমার্জিত রুচি লোকের হস্তে পড়িয়া এবং সঙ্গে শিক্ষিত সুধীগণের সহানুভূতি না পাইয়া সং দিন দিন অবনত হইতেছিল।'[৩৭]

সঙ ছিল প্রতিবাদের এক বড় মাধ্যম যা আজ প্রায় পুরোপুরি হারিয়ে গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে চপলাকান্ত ভট্টাচার্য বলেছিলেন, 'সঙ ভালো জিনিস, কিন্তু-সঙ নিয়ে ভদ্রলোকেরা কেউ তো কিছু করল না। জেলের বাড়ি যাবে, ডোমের বাড়ি যাবে-কেউ তো করেনি। যদি কষ্ট করে যেতে অনেক হারিয়ে যাওয়া জিনিস আজ হারাত না।'[৩৮]

শিবগাজন উপলক্ষে সঙ অন্যতম আকর্ষণ ছিল। এখনও বহু শিব মন্দিরে গাজন হয়। কোথাও ভাব ও রসের দিক থেকে এই গানগুলি খুবই সমৃদ্ধ হলেও প্রাচীন সঙ আর দেখা যায় না। সঙের সেইরকম রমরমাও আর নেই। এখন সেই মনোরঞ্জনের সঙ আর নেই। সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বিনোদনের ধরণ বদলেছে। লোকজ উপাদানের গর্ভে জন্ম নেওয়া বাংলার লোকসংস্কৃতিতে আধুনিকতার হাওয়া লেগেছে। মঞ্চকেন্দ্রিক বিনোদনের বদলে গণমাধ্যম যেদিন থেকে মানুষের ঘরে ঠাঁই নিয়েছে, সেদিন থেকেই নয়া চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে লোকসংস্কৃতি। বিনোদনের নানাবিধ পসরার দৌরাত্ম্যে বাংলার চিরন্তন সংস্কৃতি আজ অবলুপ্তির পথে। চৈত্রসংক্রান্তির বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রচলিত সঙ ও সঙ-গানের আজ বহুলাংশে বিলুপ্তি ঘটেছে। বর্তমান সময়ে পরিবেশ ও রুচির পরিবর্তনের ফলে সঙও অবলুপ্ত। স্বাধীনতার পর আধুনিক শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে সামাজিক অগ্রগতির কারণে সঙ-এর অনুষ্ঠানের বদল ঘটেছে। আজকের শিক্ষিত আধুনিক সমাজ সঙ-এর অশ্লীলতাকে বর্জন করেছে। সামাজিক মাধ্যমের বহুমাত্রিক ব্যবস্থায় তাঁরা মগ্ন হয়ে পড়েছেন। কৃষিতে প্রযুক্তি আসায় লোকজন চাষবাস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বৈশাখ চৈত্র মাসেও মাঠে ধান কাটা হয়। জীবিকার সন্ধানে সঙ শিল্পীরা পৃথক পৃথক পেশায় যুক্ত হয়েছেন। এইভাবে একে একে বিলুপ্তির পথে চলেছে বাউল, ঝুমুর, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, জারী, মুসলিম বিয়ের গান, ফকিরি গান, দরবেশী গান, রামায়ণ, শীতলা মঙ্গল, সত্যপীর, পট, মনসা ভাসান, ভারত গান, সীতাচুরি, লাহাংকারি, চৈতি বাউল, তুক্ষা গান, ময়ূরপঙ্ক্ষী, পাঁচালী প্রভৃতি লোকসংগীত ও লোকনাট্য।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে। দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ১৯৭২। পৃ.১৩১।

২. আনন্দবাজার পত্রিকা। তারিখ ৩.১.২০১৬।

৩. জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও সাংস্কৃকি ইতিহাস, সম্পাদনা: বিনয় ঘোষ। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। পুস্তক প্রকাশক। কলকাতা। ১৯৫৭। পৃ. ৭২৭-৭২৮।

৪. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে। দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ১৯৭২। পৃ. ৭।

৫. দীপঙ্কর ঘোষ। লোকায়েতের আত্মকথা। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। ২০২১। পৃ. ৫৪৯।
৬. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে। দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ১৯৭২। পৃ. ২০।
৭. পূর্বোক্ত। পৃ. ৩।
৮. দীপঙ্কর দাস। নীলোৎপল । শারদ সংকলন। ১৩৮১। পৃ. ১।
৯. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে। দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ১৯৭২। পৃ. ১।
১০. স্বপন বক্সী। সঙের সেকাল-একাল। পুরশ্রী। কলকাতা। ২০০৯। পৃ. ২১।
১১. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে। দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ১৯৭২। পৃ. ১০৩।
১২. আনন্দবাজার পত্রিকা। কলকাতার কড়চা। তারিখ-১২.৪.২০২১।
১৩. স্বপন বক্সী। সঙের সেকাল-একাল। পুরশ্রী। কলকাতা। ২০০৯। পৃ. ২২।
১৪. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে। দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ১৯৭২। পৃ. ২৬।
১৫. পূর্বোক্ত। পৃ. ৬৮।
১৬. স্বপন বক্সী। সঙের সেকাল-একাল। পুরশ্রী। কলকাতা। ২০০৯। পৃ. ২২।
১৭. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে। দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ১৯৭২। পৃ. ৩৪।
১৮. দীপঙ্কর ঘোষ। লোকায়েতের আত্মকথা। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। ২০২১। পৃ. ১৩২।
১৯. পূর্বোক্ত। পৃ. ২৭২।
২০. পূর্বোক্ত। পৃ. ২৩৪।
২১. দীপঙ্কর দাস। নীলোৎপল। শারদ সংকলন। ১৩৮১। পৃ. ১।
২২. পূর্বোক্ত। পৃ.২।
২৩. পূর্বোক্ত। পৃ. ৪।
২৪. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে। দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ১৯৭২। পৃ. ৫৬।
২৫. পাঁচুগোপাল বক্সি। দ্বিশত জন্মবর্ষে বিদ্যাসাগর, জন্ম ও কর্ম। পারুল। ২০১১। পৃ. ৭৫-৭৬।
২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সঞ্চয়িতা। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ। ১৩৩৮। পৃ. ৫৭১।
২৭. পূর্বোক্ত। পৃ. ৬৪।
২৮. পূর্বোক্ত। পৃ. ৮৪।
২৯. আনন্দবাজার পত্রিকা। তারিখ ১৩.৪.২০২১।
৩০. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে। দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ১৯৭২। পৃ. ৫৯।
৩১. পূর্বোক্ত। পৃ. ৬৭।
৩২. পূর্বোক্ত। পৃ. ১০০।
৩৩. পূর্বোক্ত। পৃ. ৪।
৩৪. পূর্বোক্ত। পৃ. ১৭১।
৩৫. পূর্বোক্ত। পৃ. ১৯০-১৯৩।
৩৬. পূর্বোক্ত। পৃ. ৫।

৩৭. পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৪।
৩৮. দীপঙ্কর ঘোষ। লোকায়েতের আত্মকথা। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। ২০২১। পৃ. ৫৪৯।

* 'শারদা আইন' হলো 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন'। রায় সাহেব হারবিলাশ শারদা ১৯২৭ সালে হিন্দু বালিকা বিবাহ বিল উত্থাপিত করেছিলেন। ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ১৯২৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর বিলটি আইনে পরিণত করে। সমগ্র দেশবাসীর জন্য কার্যকর হয় ১৯৩০ সালের ১ এপ্রিল থেকে তাতে বালিকাদের বিয়ের বয়স ন্যূনতম ১৪ বছর এবং বালকদের ১৮ বছর করা হয়।